এখন অবধি যা বিশ্বাস করি তা হলো, এই আক্রমণ কেবল মাত্র সাম্প্রদায়িক হামলা ছিল না। এতে অনেকগুলি বিষয় জড়িত যেমন, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এলাকাভিত্তিক সামাজিক বৈষম্য ও মুক্তবাজার অর্থনীতির কল্যাণে সৃষ্ট জটিলতা ও অভিঘাত। এসবের আলাদা করে বিশ্লেষণ থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় পাঠকের খেই হারানোর ব্যাপার ঘটবে।

৮

ঔপনিবেশিক সময় থেকেই যদি ধরি তাহলে দেখতে পাব– সাম্প্রদায়িকতা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে উপস্থিত আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও রাষ্ট্র জীবনে– কখনো জাতি ও জাতীয়তাবাদের নামে কখনো বা ধর্মের আবরণে। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ধর্মীয় মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতাকে গুলিয়ে ফেলি। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আমরা সময়ে-সময়ে কথা বললেও জাতি ও জাতীয়তাবাদের নামে স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে যে সাম্প্রদায়িকতার সংস্কৃতি চালু আছে তা নিয়ে তেমন চর্চা হয় না বললেই চলে। সাম্প্রদায়িকতা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অংশ, এই কথাটি মানতে না চাইলে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা যাবে না। বাঙালির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে আমরা যে প্রচেষ্টা চালাই তা জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সত্যকে মেনে নিতে না পারলে সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবেলা করা যাবে না। আমাদের বদ্ধমূল ধারণাজাত বিশ্বাস দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে আড়াল করলে তা ধীরে-ধীরে আমাদের সমস্ত চিন্তা চেতনাকেই এক সময় গ্রাস করবে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার শেকড় কতটা প্রোথিত তা বোঝার জন্য খুব বেশি পড়াশোনার প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন ব্যাখ্যায় আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী অধিকাংশ সময়ে এই অমোঘ সত্যকে আড়াল করতে চান। শরীরের ক্ষত লুকিয়ে রাখলে ক্ষত শুকায় না, এর চিকিৎসা করতে হলে একে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা নিতান্ত জরুরি। রামু বাংলাদেশের বাইরে আলাদা কোনো অঞ্চল নয় তাই স্বাভাবিকভাবেই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব এতেও পড়েছে। কিন্তু, সম্প্রদায়গুলোর দীর্ঘ দিনের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্গত মিল, রামুর মানুষকে অন্যভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। কিংবা অন্যভাবে ভাবতে শেখায়নি। তাই সবাই বলছি রামু ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলনক্ষেত্র।

সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের কারণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমাদের দেশ তথা ভারত উপমহাদেশে প্রাক-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক সময়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের মানসিকতা নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হলেও পরবর্তী সময়ে ১৯৪৭ এর পর পাকিস্তান আমলে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য অঞ্চলে, '৯০-এ বাবরি মসজিদ ভাঙার পরবর্তী সময়ে, ২০০১-এর নির্বাচন-উত্তর সময়ে, সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর পর ২০১২ সালে রামুতে মোটা দাগের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আমাদের সহজেই চোখে পড়লেও দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক সাম্প্রদায়িকতা আমাদের নজর এড়িয়ে, সভ্যতার কানাগলি বেয়ে পৌঁছে গেছে অনেক দূর। আমরা যারা সচেতনভাবে এই বৃদ্ধি ঠেকাতে পারতাম তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি একটি 'ডিফেন্স লাইন' তৈরি করতে।

'সাম্প্রদায়িকতাকে' আমি প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করি, প্রথমত প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা এবং দ্বিতীয়ত প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িকতা। প্রথমোক্ত সাম্প্রদায়িকতা আমরা অবচেতন মনে লালন করি। যা আমাদের কথায়, কাজে, আচরণে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে। এটি সামাজিক সাম্প্রদায়িকতা। খুবই প্রচলিত উদাহারণ হতে পারে– 'আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমার দুজন হিন্দু বন্ধু ছিল'। বক্তা এখানে অবচেতন মনে সাম্প্রদায়িকতা লালন করেন। কিভাবে? উত্তরটা খুবই সহজ– এখানে বক্তার বন্ধুদের নাম ছিল হয়ত বা অমল, বিমল এবং তাদের ধর্ম ছিল সনাতন। বক্তা ধর্ম বিচার করে বন্ধুত্ব করেছিলেন এমনটা নয়। কারণ ধর্ম বিচার করে কখনো বন্ধুত্ব হয় না। বন্ধুত্ব কোনো অলংকার নয় যে তার বাহ্যিক আবরণটাই কেবল চোখে পড়বে। কিন্তু পেছন ফিরে তাকালে কেন যেন বন্ধুর ধর্মই আগে মনে পড়ে। কেন? শুধুই কি অভ্যাসবশত? এই তালিকা আরও দীর্ঘ হবে তা বলাই বাহুল্য।

পেশাগত জীবনে আমাকে প্রায়শই মুখোমুখি হতে হয় ভিন্ন এক সাম্প্রদায়িকতার। আমার যাবতীয় অর্জন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান না হয়ে আমাকে লজ্জা দেয় লঘুত্বের দায়ে। আমি যখন ২০০১ সালে ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য কমিটির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যাই, আওয়ামী লীগ সমর্থিত আইনজীবী সমিতির সভাপতি আমার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদগুলো দেখে প্রশ্ন করেন, 'আপনার সব পড়াশুনাই তো দেখি ইন্ডিয়ায়, তা সেখানে থেকে গেলেন না কেন?' সভাপতি মহোদয় কি জানেন না, বছরে কী পরিমাণ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ছেলেরা ভারতে পড়তে যায় কিন্তু সেখানে থেকে যায় না? প্রায় নয় বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে পড়াশুনা শেষ করে ২০১১ সালে দেশে ফিরে এসে ঢাকা সিটি

কর্পোরেশন উত্তর এর আইনজীবী হিসাবে নিয়োগলাভের জন্য সাক্ষাৎকারের সময়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যখন একই প্রশ্ন করেন তখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশ ২০০১ সাল থেকে খুব বেশি দূর এগোয়নি, অন্তত সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার দিক থেকে। এসব ছাড়াও, প্রায়শই যেসব সাম্প্রদায়িক শব্দ আমরা শুনি অথচ আমল করি না তা হলো, 'বাবু' বলে সম্বোধন করা, গভীর বন্ধু হলেও নিজেদের মধ্যে কোনো তর্কযুদ্ধে হারলে 'মালাউন' কিংবা 'নেড়ে' বলে গালি দেয়া অন্যতম। হালে আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এই অপমানের সবচেয়ে বড় শিকার। এসব বিকৃত শব্দগুলোর শেকড় এতো গভীরে যে তাদের সহজে মূলোৎপাটন করাও সহজ নয়। তাছাড়া, এসব শব্দগুলো শুনতে-শুনতে আমরা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে সেসব আর অস্বাভাবিক মনে হয় না। তবে কবিগুরুর ভাষায়– এই মেনে নেওয়া মনে নেওয়া কিনা সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এ সংক্রান্ত কোনো আইন না থাকাও, আমাদের এই বৈরী আচরণ থেকে, পশ্চাৎপদতা থেকে বের হয়ে আসতে না পারার অন্যতম কারণ বলে আমি মনে করি। আজ আমাদের ভাববার সময় হয়েছে, আমাদের দেশেও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একটি আইন প্রণয়নের। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ নিয়ে কার্যকর আইন ও তার বাস্তবিক প্রয়োগ রয়েছে। আমাদের দেশেও এরকম একটি আইন কার্যকর থাকলে, আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নে ও সামাজিক সাম্প্রদায়িকতা নির্মূলে ভূমিকা রাখতে পারে। এতে করে, অন্তত প্রতিদিন যে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘুর নিত্যদিনের যন্ত্রণার শুরু হয় তা কিছুটা হলেও কমবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাম্প্রদায়িকতা তার আপাত নিরীহ রূপ নিয়ে এমনভাবে উপস্থিত যে অনেক সময় তা নিয়ম বলে ভ্রম হয়। যেমনটা ধরা যাক– ঢাকা থেকে প্রতিদিন ছেড়ে যাওয়া দূর পাল্লার বাসগুলোর কথা। বাস ছাড়ার সাথে-সাথেই স্পিকারে বেজে ওঠে পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ। বাংলায় অনুবাদ করা হয় বলে বুঝতে চেষ্টা করি কী বলছে। মহান সৃষ্টিকর্তার গুণগান আর যাত্রা শুভ হওয়ার কামনা। এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু, প্রতিবারই অপেক্ষায় থাকি, পবিত্র কোরআন পাঠ শেষে এবার বুঝি বেজে উঠবে ত্রিপিটক, বাইবেল কিংবা ভগবত গীতা থেকে নির্বাচিত কোনো অংশ বিশেষ। কিন্তু আমার সে আশা আশাই থেকে যায়।

বারডেম হাসপাতালের ভিআইপি কেবিনে এক পরিচিত রুগীকে দেখতে গিয়ে দেখি, একটি কাঠের তাকে সারিবদ্ধভাবে কোরআন, বাইবেল আর গীতা সাজিয়ে রেখেছে রুগীর পড়ার জন্য। কি সুন্দর ভাবনা। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ত্রিপিটক পেলাম না। .০৬% এখানেও অনুপস্থিত! সংখ্যার আধিক্য প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তায় প্রভাব ফেলেছে।

টিভি চ্যানেলগুলোর প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান-বিন্যাসের দিকে যদি দৃষ্টি দিই, তাহলে একই চিত্র চোখে পড়ে। দিনের কিংবা সপ্তাহের কোনো না কোনো ভাগে একটি বিশেষ চিন্তার দর্শকদের ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা। তা সে টিভির মালিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হন আর বিপক্ষেরই হন– চিত্রটা মোটামুটি একই। এতে করে তাদের অনুষ্ঠানের 'টি আর পি' কতটুকু বাড়ে জানি না তবে 'মুরতাদ' কিংবা 'কাফের' অভিধা পাওয়ার সম্ভাবনা অন্তত থাকে না। এই 'সেফগার্ড' নিয়ে রাখার প্রবণতা সমাজের সর্ব ক্ষেত্রেই স্পষ্টত বিরাজমান যা আমাদেরকে ব্যবহারিক সাম্প্রদায়িকতা শেখাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আপাত দৃষ্টিতে এসব স্বাভাবিক ধর্মাচরণ মনে হলেও এতে সংখ্যালঘুর ধর্মাচরণ অনুপস্থিত বিধায় তা নিরপেক্ষতা হারায় এবং সাম্প্রদায়িকতার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। এ বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ হলো মুক্তিযুদ্ধের সময়কে কেউ-কেউ না বুঝে 'গণ্ডগোলের সময়' বলে অভিহিত করে। এতে যে শুধু ত্রিশ লক্ষ শহীদের অপমান করা হয় তাই নয়, এটি রীতিমত একটি অপরাধ। অনুরূপভাবে, '৯০ এ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরবর্তী সহিংসতা কিংবা ২০০১ এর নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ও সাম্প্রতিক রামুর সহিংসতাকে নিত্যদিনের 'গণ্ডগোলের' অভিধায় ফেললে তাতে শুধু আক্রান্তের বেদনাকেই বাড়ানো হয় না, আক্রমণকারীরাও উৎসাহিত হন। তাছাড়া, স্বাধীন সেন যেমন বলেছেন,

> নিপীড়নের ঐতিহ্যকে লুকিয়ে রাখলে নিপীড়ন প্রতিহত ও প্রতিরোধ করা যায় না। স্মৃতিকে সতত জাগ্রত রাখার মধ্য দিয়েই প্রবলের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী লড়াই সম্ভব। অসাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠা, সেকারণেই, সতর্ক অনুশীলন আর সাধনার বিষয়। প্রতিদিনের আত্মশুদ্ধি, লড়াই, অনুশীলন আর সাধনার মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে হয়, অসাম্প্রদায়িক অবস্থা ও অবস্থান জারি রাখতে হয়।[১]

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অনুসারীদের নিজেদের ধর্ম ব্যতিত অন্যান্য ধর্মের অনুশাসন সম্পর্কে অতি সীমিত জ্ঞান, জানার অনাগ্রহ এবং অবহেলা ও অবজ্ঞার কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব যেমন বেড়েছে তেমনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'ইকুয়াল প্লেয়িং ফিল্ড' তৈরি হয়নি। অবহেলা বা অবজ্ঞার প্রচলিত শব্দগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন, 'তোমাদের বিয়েতে কী কী হয়?' 'তোমাদের বিয়েতে কি সপ্তপদি গমন হয়? ওই যে আগুন মাঝখানে রেখে বর কনে ঘোরে?' আমি বুঝিনা, স্বাধীনতার ৪১ বছর পরেও কেন আমাকে এই প্রশ্ন শুনতে হবে? কেন আমার দেশের মানুষ পারস্পরিক সম্মানবোধ থেকে অন্যের ধর্মাচরণের বিষয়েও সমানভাবে জানবে না? নিয়ম মেনে আমরা কেবল ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোতে সরকারি ছুটি কাটিয়েই দায়িত্ব সারি। বিষয়ের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করি না। এটি আমাদের দীর্ঘদিনের অভ্যাসসঞ্জাত। এটি সহজে যাবার নয়।

৯

গত ২৩ ডিসেম্বর দেশের ১৫ জন বরেণ্য নাগরিকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্মেলন ২০১২। এতে মূল থিম ছিল রামুর সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান স্যারের আমন্ত্রণে উক্ত সম্মেলনে আমার বক্তব্য রাখার ও অন্যান্য সুধীজনের বক্তব্য শোনার সুযোগ হয়েছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উক্ত অনুষ্ঠানে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়, 'বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা' হিসেবে। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই এর সংশোধন করেছি। কেননা, 'বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা' হতে হলে আমাকে সংসারধর্ম ত্যাগ করতে হয়, যেটি করার উদ্দেশ্য আপাতত আমার নেই। আমার বক্তব্যের প্রায় পুরোটা জুড়েই ছিল এই প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে বিশ্লেষণ। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে, একটি সাম্প্রদায়িক পরিচয় নিয়ে ঘরে ফেরা আমার মোটেও কাম্য ছিল না। পরদিন জাতীয় সংবাদপত্রগুলোতেও (*নিউ এইজ* বাদে) এর প্রতিফলন দেখেছি। অনলাইন সংবাদমাধ্যম বিডিনিউজ২৪ ডট কম-এ আমার এহেন পরিচয় দেখে সুদূর আফ্রিকা থেকে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানতে চেয়েছে আমি 'বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা' হলাম কবে? পরে বিডিনিউজ২৪ ডট কম এর অনুজপ্রতিম সাংবাদিক নিলয়কে ফোন করে বলাতে সেটি সংশোধিত হলো। উক্ত সম্মেলনে, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বিভিন্ন উচ্চারণের পাশাপাশি রামুর সহিংসতার পেছনে 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল' করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল বলে বেশিরভাগ বক্তা মন্তব্য করেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্যে আমি সেখানে এ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করি, পরিষ্কারভাবে বলি, এই হামলায় সব রাজনৈতিক দলের সমান ভূমিকা ছিল। রামুর ঘটনায় যেহেতু ক্ষমতাসীন দলের লোকজন জড়িত ছিল, তাহলে বিষয়টি এমন দাঁড়ায় যে সরকারই 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল' করতে চায়! আমার উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ঘটনা-পরবর্তী সময়ে দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদনই যথেষ্ট। সুতরাং, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল' করার জন্যে এই সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয় বলে যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তা রাজনৈতিক সুবিধালাভের আশায়, সত্যকে আড়াল করা এবং বরাবরের মতোই 'আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নেই' বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশের বিবেকবান মানুষগুলো যখন মিথ্যা বলে তখন আমাদের আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। আমাদের সমস্ত চিন্তাচেতনা যদি ক্ষমতার রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে আমাদের ভবিষ্যতের ভাবনা কোন পথে এগুবে তা এখনই বলে দেয়া যায়। আমার বক্তব্যে, রামুর সহিংসতার কারণ হিসেবে অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে 'ভূমি গ্রাস' একটি মুখ্য কারণ ছিল বলে আমার বিশ্লেষণ তুলে ধরি। অবাক করার বিষয়, পরবর্তী কোনো বক্তাই এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র আলোকপাত করেননি। অথচ, অনেক বক্তা আমার বক্তব্যের সূত্র ধরে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আমি যে সামাজিক ও প্রাত্যহিক সাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ তুলে ধরেছি তা কোনোভাবেই কারো আলোচনায় উঠে আসেনি।

১০

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িকতা আমাদের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর সরকারগুলো ভোটের রাজনীতির কারণে প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আশ্রয়প্রশ্রয় দিয়েছে। ধর্মান্ধতা– রাজনীতি, প্রশাসন ও আমাদের যাপিত জীবনে এমনভাবে প্রোথিত যে সেটাকে আর আলাদা করে দেখার উপায় নেই। ১৯৭৯-এ সংবিধানে "বিসমিল্লাহির-রহ্‌মানির রাহিম" শব্দগুলো সংযোজনের মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের পথ চলা শুরু, ১৯৮৮-তে এসে সেটা রাষ্ট্রধর্ম "ইসলাম" ঘোষণার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। ১৯৭২-এর সংবিধানের এই বিচ্যুতি আমাদেরকে যতটা না ধর্মপ্রাণ অভিধায় সিক্ত করেছে তার চেয়েও করেছে চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক হিসেবে।

আন্তর্জাতিক প্রচারে আমরা 'মধ্যপন্থী' নামে পরিচিত হলেও এর বাস্তব অবস্থা ছিল ভিন্ন। শিক্ষিত মহলের একাংশ এই ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকেন যে, বাংলাদেশ একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র এবং সেখানে সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করছে। এই ভাবনার সমস্যা হলো এই যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া সমস্ত নির্যাতনকে অস্বীকার করা হয়। এই সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, সমাজ জীবনে, অর্থনীতিতে, এমনকি দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতায়। জাতির উপর সব চেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক আঘাতটি এলো ২০১১ সালে, যেখানে সংবিধান পুনরায় সংশোধন করে বলা হলো, "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" বলার অপেক্ষা রাখে না, এই সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও বিলুপ্ত হলো। এদেশের সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অস্বীকার করে সবাইকে 'বাঙালী' বানানোর অপচেষ্টা, যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নয়, ধর্মান্ধদের হাটহাজারীতে বাড়ি-ঘরে, রামুতে বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন দিতে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং রংপুরে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বাড়িতে, মসজিদে আগুন জ্বালানোর দুঃসাহস যুগিয়েছে।

১১

রাজনৈতিক বিবেচনায় কোন রাজনৈতিক দল অসাম্প্রদায়িক কিংবা সাম্প্রদায়িক বলা বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই দুরূহ ব্যাপার। এটি ভাববার কোনো কারণ নেই যে, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুসারী হলে কোনো ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক হবেন না। রামুর সহিংসতার ঘটনায় এটি এখন স্পষ্ট। সাম্প্রদায়িকতা কিংবা অসাম্প্রদায়িকতার প্রথম পাঠ ব্যক্তির পরিবার থেকে শুরু হলেও পরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রগুলো তাকে ভিন্ন মতে বিশ্বাসী করে তুলতে পারে। একজন বামপন্থী যেমন ক্ষেত্রবিশেষে সাম্প্রদায়িক হতে পারেন, তেমনি একজন ডানপন্থীও তার ব্যক্তি জীবনে অসাম্প্রদায়িক হতে পারেন। এক্ষেত্রে স্বাধীন সেনের কথার গুরুত্ব অপরিসীম:

> ধর্ম বিশ্বাসের সাথেও সাম্প্রদায়িকতার কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। একজন নাস্তিক যেমন সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে পারেন তেমনি একজন ধর্ম বিশ্বাসীও অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে পারেন। কেননা, সাম্প্রদায়িকতা মানব চরিত্রের কোন অপরিবর্তনীয় বা ধ্রুব বৈশিষ্ট্য নয়। একই মানুষকে বিভিন্ন সময় বা পরিবেশ সাম্প্রদায়িক কিংবা অসাম্প্রদায়িক করে তুলতে পারে। সকালের অসাম্প্রদায়িক মানুষটিও বিকেলে হিংস্র সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে পারেন। যে সংখ্যাগুরু মানুষটি বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক, তিনিই ভারত বা আমেরিকা গিয়ে হয়ে উঠতে পারেন চরম সাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব পরিস্থিতিগত।[২]

১২

আগেই বলেছি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তার লাভ করেছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। বিভিন্ন সরকারের আমলে এই বিস্তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে যা সমূলে উৎপাটন করতে হলে চাই সমন্বিত প্রচেষ্টা। যে সমতাভিত্তিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমাদের অগ্রজরা এই দেশকে স্বাধীন করেছিলেন, তা থেকে আমরা শুধু সরে গেছি তা নয়, অনেকাংশে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছি। যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাচেতনা থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, তার খানিকটা হলেও রূপ পেয়েছিল ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি দেশের রাজনৈতিক অবস্থান ক্রমশ ইসলামভিত্তিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দিয়েছে ও তৎকালীন সরকার দেশের বিরাজমান ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনর্গঠনে এবং দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ইসলামী দেশগুলোর দিকে ঝুঁকেছে সাহায্যলাভের আশায়। তাছাড়া পাকিস্তানের প্রতি ইসলামী দেশগুলোর সমর্থনও আমাদের দেশের পলিসি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এরই ফলে আমরা দেখেছি জাতির পিতা শেখ মুজিব লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং আরব দেশগুলোর চাপে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর মতো প্রতিষ্ঠান যা কিনা ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তা পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর পরের সরকারগুলোর আমলে আসতে থাকা এই বৈদেশিক সাহায্য ধর্মীয় রাজনীতির বিস্তারসহ ধর্মীয় মৌলবাদ বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। শিক্ষা ও চিকিৎসা সহায়তার আড়ালে আরব দেশের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় মৌলবাদীদের লালনপালন ও সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে পরবর্তী সামরিক ও বেসামরিক সরকারগুলো ক্ষমতায় থাকার প্রয়োজনে, প্রকাশ্যে ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে পুনর্বাসন করা সহ ধর্মভীরুতার প্রশ্নে, ভোটের রাজনীতির কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মের সম্পৃক্ততা পরিহার করতে পারেনি। সৎসাহস দেখিয়ে বলতে পারেনি– বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা মূল চাবিকাঠী।

এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে, তা সে ইসলামী দেশগুলোর প্রতিই হোক আর ভারতের প্রতিই হোক, সীমান্ত হত্যাসহ অধিকাংশ বিষয়ে আমরা আমাদের সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে পারিনি। সীমান্তে হত্যা নিয়মে পরিণত হলেও এর বিরুদ্ধে ভ্রষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর মতলবি প্রতিবাদ ছাড়া কার্যকর সমন্বিত নাগরিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। এই সভ্য হওয়ার ভান ছেড়ে সমস্বরে আওয়াজ তোলার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে।

দেশের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণী স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে চোখ-কান বুঁজে থাকার কারণে, চোখের আড়ালে সংগঠিত হয়েছে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক দল ও লুটেরা শ্রেণী। সাম্প্রদায়িকতা বিস্তার লাভ করেছে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। মধ্যবিত্তের একাংশ মনেপ্রাণে এই সাম্প্রদায়িকতার ঘোরবিরোধী কিন্তু তারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার নন। জোরালোভাবে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না। ফলে, রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের খেয়াল-খুশি মতো জনগণের উপর সবকিছু ইচ্ছেমতো চাপিয়ে দিতে পারে। বর্তমান সরকার অতি সম্প্রতি ধর্মীয় মৌলবাদীদের চাপে পড়ে দুই ধর্মের অনুসারীদের বিবাহ নিবন্ধন আইনটি সংসদে পাস করেনি। মোল্লারা রাস্তায় মিটিং-মিছিল করলেও তথাকথিত প্রগতিশীলরা নীরব থেকেছে। নীরবতা বা নিষ্ক্রিয়তা আইনের চোখে কখনো-কখনো অপরাধ যেখানে আইন অনুযায়ী আপনার কোনো কর্ম সম্পাদনের কথা রয়েছে। সেই অর্থে আমারা সবাই অপরাধী। একটি দেশ তখনি সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হয় যখন আইন সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করে। তাছাড়া দেশ স্বাধীন হয়েছিল সকলের সাম্যতার আশায়– যা সুদূর পরাহতই রয়ে গেছে।

ঘরের মধ্যে এমন কিছু জায়গা থাকে যেখানে আমাদের নজর পড়ে না। এই সুযোগে সেখানে জমতে থাকে ধুলো আর আবর্জনা। কখনোসখনো যদিওবা ভাবি পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাব– তা বিশেষ চেষ্টা যেমন আসবাবপত্র না সরিয়ে, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই স্থানের নাগাল পাওয়া যায় না। অনেক সময় পরিষ্কারের সঠিক উপকরণটিও হাতের কাছে থাকে না। এসব কারণে ধুলার আস্তরণ পুরু হতে থাকে। একইভাবে, স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের সমাজের কোণে কোণে এমন অসংখ্য আবর্জনা জমেছে যে তা আজ এককভাবে সাফাই করা কঠিন। এই আবর্জনা আমদের মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতাকে গ্রাস করেছে, করে তুলেছে চরম প্রতিক্রিয়াশীল। নূরুল কবীরের ভাষায়,

> এই পশ্চাৎপদতা আমাদের সমাজ ভাবনার পাশাপাশি রাষ্ট্রনীতিকেও প্রভাবিত করেছে। পশ্চাৎপদ ভাবাদর্শকে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন একটি প্রগতিশীল ভাবাদর্শ। ধর্মান্ধ রাজনীতির করাল গ্রাস থেকে আমাদের ভবিষ্যতকে বাঁচাতে হলে গণতন্ত্রে গণমুখী ও সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন।[৩]

গণচীন, ইরান ও কোরিয়ার সাথে আমেরিকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, এসব দেশের উপর আমেরিকার মুরুব্বিয়ানা খাটাতে না পারার বেদনা ও তাদের সুদুরপ্রসারী স্বার্থ চরিতার্থ করবার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ায় তাদেরই মদতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনসহ নানা প্রকার সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। অথচ এরাই সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ইরাকে ন্যক্কারজনক হামলা থেকে শুরু করে সিরিয়ায়, গাজা উপত্যকায়, মিশরে, কঙ্গোতে, পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে অব্যাহত সহিংসতায় সক্রিয় মদতদাতা হিসাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। এসবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করবার পরিকল্পনা আমরা অনেকেই বুঝি না। আবার কেউ-কেউ বুঝেও না বোঝার ভান করি। এই উপমহাদেশে আমরা বহুকাল ধরে জাতীয়তাবাদের নামে, ধর্মের নামে খুব সহজেই একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি। জীবনের মানে সেদিন থেকে বর্তমানে খুব বেশি পালটেছে বলে মনে হয় না।

১৩

এবার আসি রামুর সহিংসতা প্রসঙ্গে। রামুতে সংঘটিত সহিংসতার মূলে উপরোক্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতা যেমন ভূমিকা রেখেছে তেমনি সীমিতসংখ্যক মানুষের ধর্মীয় উন্মাদনা, মিয়ানমারে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক সহিংসতা ও তার আন্তর্জাতিক অপব্যাখ্যা, স্থানীয় নেতৃত্বের দুরভিসন্ধি, ভূমি দস্যুতা, অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এ অঞ্চলে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে মৌলবাদের বিস্তারসহ অনেকগুলো কারণ কাজ করেছে। তাই একে কেবলই 'সাম্প্রদায়িকতার' বিচারে সংঘটিত সহিংসতা ভাবলে ভুল হবে। সহিংসতা সংঘটনের প্রত্যেকটি অনুঘটকদের আলাদা করে বিচার-বিশ্লেষণ না করলে এই সহিংসতার পুনরাবৃত্তি ঠেকানো যাবে না। প্রতিটি বিষয়কে আলাদা-আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে হলে বৃহৎ কলেবর প্রয়োজন এবং এর কিছুটা হলেও জাতীয় ইংরেজি দৈনিক *নিউ এইজ* এ প্রকাশিত আমার সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছি। এটি

এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিধায় বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করলাম না । প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে কর্পোরেট ভূমি দস্যুতা ও স্থানীয় অধিবাসীদের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা হ্রাস (ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন) বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করতে চাই । আমার জানা মতে এ নিয়ে কোনো গণমাধ্যম কিংবা কোনো ব্যক্তি এখনো পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে কোনো মতামত ব্যক্ত করেননি ।

১৪

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে, কক্সবাজার শহরের অধিবাসীদের অবস্থানগত বৈচিত্র্য বা সংখ্যা হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বিগত দুই দশকে চরম আকার ধারণ করেছে । কর্পোরেট ভূমি দস্যুতা এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে । বাংলাদেশের মানুষের সব সময়েই ভূমির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ছিল । সেটি বর্তমানে বেড়েছে বৈ কোনো অংশে কমেনি । ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এই সমস্যা তীব্রতর করলেও এর মূলে আছে ক্ষমতার বিভাজন ও শ্রেণী বৈষম্য । আগেই বলেছি, ১৯৮৮ সালে সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম প্রবর্তন করা, ২০১১ সালে সমস্ত জাতিগত সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে সবাইকে বাঙালি বানানোর ঘোষণা এবং সর্বোপরি, অথনৈতিক উন্নয়নের মডেল হিসেবে মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করার কারণে বাংলাদেশে রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে । এই সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন স্তরে প্রোথিত ও মজ্জাগত বিষয়– এতে কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় তা মুখ্য নয় ।

কক্সবাজার শহরের আগেকার, অর্থাৎ, ২০ বছর আগের কথাও যদি ধরি তাহলে দেখতে পাব– রাস্তার দু ধারে কিছুদূর পরপর রাখাইন সম্প্রদায়ের বার্মাটিক কাঠের তৈরি কারুকার্য খচিত ঘরবাড়ি । সম্ভবত, বন্যার কথা ভেবে মাচার মত আকৃতিতে তৈরি ছিল সেসব বাড়িগুলো । আমাদের বাড়িটিও এর ব্যতিক্রম ছিল না । সেই বাড়িগুলো সবই হারিয়ে গেছে । যেসব বার্মিজ মার্কেটের জন্য একদা কক্সবাজার প্রসিদ্ধ ছিল যেখানে রাখাইন তরুণীরা ঘরে তৈরি প্রসাধন সামগ্রী থেকে শুরু করে ঝিনুকের তৈরি উপহার সামগ্রী আর সাজগোজের উপকরণ বিক্রি করত, সাম্প্রদায়িক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল অনুসরণের কারণে তার বিলুপ্তি ঘটেছে । কাঠের তৈরি দোচালা এই দোকানগুলোই ছিল তাদের আয়ের একমাত্র উৎস । তাদের বিরাট ধনসম্পদ ছিল না, তাই তারা মুক্তবাজার অর্থনীতির থাবার আঘাত সামলাতে পারেনি । জীবনজীবিকার উৎস সেইসব ছোট্ট দোকানগুলো ক্রমে ভেঙে সেখানে গড়ে উঠেছে ইটবালির দালান, সে দালানে রাখাইনদের আর ঠাঁই হয়নি । সেখানে বাঙালির দখলদারিত্ব ক্রমশ প্রকট হয়েছে । নামমাত্র কিছু রাখাইন এখনও তাদের হাতে বোনা কাপড় আর ঝিনুকের তৈরি গহনা বিক্রি করলেও তা এতটাই নগণ্য যে উল্লেখ করার মতো নয় । ব্রিটিশ আমলের কক্সবাজার শহরের ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ ছিল যথা– "শহরের ভূমির মালিকানা রাখাইন ব্যতীত অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করা যাবে না" তা মানা হয়নি । সেসব পুরনো আইনের কথা বললে, আমাদের অনেকেরই ভূমির মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিবে । তাই আমরাও চুপ থাকি । ঢাকা শহরের মোড়ে-মোড়ে কক্সবাজারে ফ্ল্যাটের গর্বিত মালিক হওয়ার বিজ্ঞাপনও প্রশ্নের মুখে পড়বে ।

আগেকার দিনে ভূমি দস্যুতা ছিল স্থানীয়, যেখানে ব্যক্তি কিংবা দলগত স্বার্থ হাসিল করাই ছিল মুখ্য । কিন্তু বর্তমানের শক্তিশালী যূথবদ্ধ অপ্রতিরোধ্য ব্যবসায়ী দল নতুনভাবে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানরূপে আবির্ভূত হওয়ায় ভূমি দস্যুতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে । দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো কক্সবাজার এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও এর চরম পরিণতির শিকার হয়েছে । তাদের না ছিল অর্থনৈতিক শক্তি, না ছিল প্রতিরোধ করার ক্ষমতা । এই কর্পোরেট ভূমি দস্যুরা এতই ক্ষমতাবান যে সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে শুরু করে সবাই এদের হুকুম তামিলে ব্যস্ত । কোনো জমি এদের পছন্দ হলেই হলো, সেটি যে কোনো মূল্যে তাদের পাওয়া চাই, প্রয়োজনে জোর করে, নইলে দেশের উন্নয়ন থমকে পড়বে যে! এসব নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের প্রয়োজনে রিহ্যাব নামে একটি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হলেও বাস্তবিক অর্থে এদের উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই । সরকারের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে এদের ব্যবসা দিন দিন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে ।

গত দুই দশকে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে, কক্সবাজার ক্রমেই অবকাশ যাপনের নগরীতে পরিণত হয়েছে । ইউরোপ-আমেরিকার কায়দায় দুই থেকে পাঁচ তারকা চিহ্নিত ব্যক্তি-মালিকানাধীন হোটেলগুলোয় কী নেই– ইতালীয় খাবার থেকে শুরু করে হরেক রকম মদের বিজ্ঞাপনসহ বিশালকায় বিলবোর্ড শহরে ঢোকার মুখেই চোখে পড়বে । কর্পোরেট কালচারের অংশীদার এসব হোটেলগুলোয় বড়-বড় এনজিও থেকে শুরু করে দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সেমিনার ও সভা করার উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নেয় । কাজের শেষে 'সমুদ্র স্নান' এর সুযোগ

সবাইকেই আকৃষ্ট করে। দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে সবাই মুগ্ধ হয়ে সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউ উপভোগ করেন! এই কর্পোরেট কালচারে প্রশ্ন করার সময় কই– এ জমি কার ছিল? এই কারণে, কক্সবাজার শহরের লাল দিঘির পূর্বপাড় পর্যন্ত চলে আঞ্চলিক ভাষা আর পশ্চিম পাড় থেকে বাকি অংশে চলে সাধু ভাষা। অর্থাৎ, ওইসব হোটেলগুলোতে ভদ্রলোকীকরণের কৌশলগত কারণে স্থানীয়রা চাকরির সুবিধাও পায়নি। রাখাইনরাতো এখন বইয়ের পাতায় ইতিহাস। এই হোটেল কালচার বা কর্পোরেট কালচারের কারণে হারিয়ে গেছে কক্সবাজারের চিরচেনা ঐতিহ্য। রাখাইন সম্প্রদায়সহ অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় হয়েছেন নিজ দেশে পরবাসী। স্থানীয় দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ও এই ভয়াবহ ভূমি গ্রাসের হাত থেকে রেহাই পাননি। কক্সবাজারের ভূমির মালিকানা খোঁজ করলে দেখা যাবে অধিকাংশ মালিকই কক্সবাজারের বাইরের লোক আর স্থানীয়রা বহিরাগতদের সম্পত্তির পাহারাদার! মালয়েশিয়ায় স্থানীয়দের অংশীদারিত্বনির্ভর যে পরিকল্পনা তাদের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে তা কক্সবাজারেও প্রয়োগ করা যেত যদি সরকার ও স্থানীয়রা অসাম্প্রদায়িক উন্নয়ন চাইত। কিন্তু সময় অনেক গড়িয়ে গেছে। কক্সবাজারের সমস্ত ভূমি এখন নিঃশেষিত– কী সমতল কী ঢিবি সবই পরাক্রান্তদের দখলে। তাহলে উপায়? যারা এখনো কক্সবাজারে একটি অবকাশ যাপনের জন্য কিছু বানাতে চান তাদের কী হবে? কেন, আশেপাশের জায়গা? সত্যি তো, কক্সবাজারের কাছেই নদী আর পাহাড় ঘেরা কি সুন্দর গ্রাম! ওরা কারা ওখানে? এইসব কাঁচাপাকা বাড়ী কাদের? ওরা কী করে? ওরা কী জায়গা বিক্রি করবে? এইসব সর্বনাশা প্রশ্নগুলো কি আপনার মনেও ঘুরপাক খেয়েছে? কি জানি বাপু। বিগত কয়েক বছর ধরে, আপনারা যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করেন তাদের যেন কক্সবাজার গিয়ে শুধু সমুদ্র স্নান সেরে বাড়ি ফিরতে না হয় তার জন্যে রামুর অদূরে দক্ষিণ মিঠাছড়ি নামক স্থানে একশ একর জায়গা নিয়ে নির্মাণ শুরু হয়েছে বিনোদনের জন্য পার্ক! এলাকাবাসীর চাষের জমি কেড়ে নিয়ে সেসব নির্মাণ হলেও আপনারা কেউ তেমন মাথা ঘামাননি। স্থানীয়রা প্রতিবাদ-সমাবেশ করেও লাভ হয়নি। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা দেবার জন্যে অনেককেই মাসুল গুনতে হয়েছে। সরকারি পেটোয়া বাহিনী এক্ষেত্রেও ধনী সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত থেকেছে! আপনাদের মনে একবারও কি প্রশ্ন জেগেছে প্রকৃতি শোভিত বাংলার অপরূপ গ্রামে আলাদা করে বিনোদনের জন্য পার্ক নির্মাণ কাদের জন্য? রামুর দরিদ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে, মন্দিরে আগুন কেন? কারা এর পেছনে তা কি এখনো বোঝার বাকি আছে? রামুর স্থানীয় ভূমি দস্যুদের সামাল দিতেই রামুর স্থানীয়রা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, এই কর্পোরেট ভূমি দস্যুতা তাদের কাছে মরার উপর খাঁড়ার ঘা ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে?

১৫

রামুর ঘটনায় স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় তথা সমগ্র বাঙালি বৌদ্ধরা স্পষ্টতই দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহলের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের চেষ্টা ও এতে সরকারি মদতের ফলে এই বিভাজন পুরো বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে দুর্বল করেছে। বৌদ্ধদের সুরক্ষার নামে রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন নামসর্বস্ব সংগঠন। রাতারাতি কেউ কেউ হয়ে উঠেছেন সরকারি দলের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, কেউ বা হাতিয়ে নিয়েছেন বিপুল অর্থ– কখনো বা ফানুস উড়িয়ে আনন্দ করার জন্যে, কখনো বা ধর্ম পালনের বাহুল্যতায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই দৌড়ে পিছিয়ে ছিলেন না। বিদেশ সফর আর অন্যান্য প্রাপ্তিযোগ তো ছিলই। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরাও কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না এই ইঁদুর দৌড়ে। যারা ইতিপূর্বে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগামী ছিলেন তাদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। রামুর ঘটনার পরে, তাদের আচার-আচরণ রামুর আক্রান্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে যুগপৎ লজ্জা আর ঘৃণা যুগিয়েছে। সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে গিয়ে অনেকে নির্লজ্জভাবে মিথ্যাচার করেছেন, পুলিশ ও প্রশাসনের নীরব ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা দূরে থাক, তাদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন! পাকিস্তান আমলের শেষভাগে উখিয়ায় একটি মন্দিরে হামলা হলে আমাদেরই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু লোক পাকিস্তানের তৎকালীন সরকারের পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন। সেটি যেমন ভুল ছিল, এখনকার এই দুর্বৃত্তায়নও ভুল এবং অন্যায়। ১৯৭১ সালেও কতিপয় বৌদ্ধ নেতাদের আচরণ ইতিহাসে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে। ইতিহাস তার নিজ নিয়মে সেসব ধারণ করবে। শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের দায় থেকে নয় সমগ্র জাতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজনে সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একসাথে সংকট মোকাবিলা করাই ছিল এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরণ। কিন্তু আমরা আমাদের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি। সরকার তার ভাবমূর্তির সংকট সামলাতে গিয়ে সেই পুরনো 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পদ্ধতি ব্যবহার করেছে এবং দৃশ্যত সফলও হয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষী। এই অপরাধের দায় থেকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এইসব তথাকথিত নেতারা ক্ষমা পাবেন কিনা তা ভবিষ্যতই বলে দেবে।